রাজনীতির রবীন্দ্রনাথ –২

সৈয়দ আবুল কালাম

পূর্ববর্তী পর্বের পর ...

(তিন)

কংগ্রেস সৃষ্টির মূর্ত পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> “এইরূপে য়ুরোপীয় সভ্যতার উপর আমাদের অবিশ্বাস ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মনে অল্পদিন হইল ইংরাজের উনবিংশ শতাব্দীর স্পর্ধিত সভ্যতার উপর এইরূপ একটা ঘোরতর সংশয় জন্মিয়াছে। সমস্ত ফাঁকি বলিয়া মনে হইতেছে। সকলে ভীত হইয়া মনে করিতেছেন আমাদের প্রাচীন রীতিনীতির জীর্ণ দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লওয়াই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। ইংরাজী সভ্যতার মধ্যে সহৃদয়তা ও অকৃত্রিমতা নাই। ইহার প্রধান কারণ ইংরাজের নিকট হইতে সহৃদয়তা প্রত্যাশা করিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি এবং আমাদের আহত হৃদয়ের বেদনায় ইংরাজী সভ্যতাকে আমরা সম্পুর্ণ অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিতেছি।”

এদেশের শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের চিন্তাজগতের বিবর্তনের ধারাটি খুবই সংক্ষেপে প্রতিফলিত হয়েছে এই বক্তব্যে।

১৮৩৫ এ প্রবর্তিত ইংরেজ উপনিবেশিক শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ উপনিবেশিক নীতির সমর্থক ও রক্ষক একটি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়ে তোলা। মেকলের ভাষায়, এরা ইংরেজ শাসক ও কোটি কোটি শাসিতের মধ্যে পালন করবে দোভাষীর ভূমিকা, "রক্ত ও বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচিবোধ, মতামত, নৈতিকতা ও বোধশক্তিতে ইংরেজ"। এই শিক্ষা ছিল ব্যয়বহুল। ফলে তা সীমিত ছিল জমিদার-মধ্যস্বত্বভোগী-মহাজন ও বণিক শ্রেনীর মধ্যে। "বৃটিশ শিক্ষানীতির ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ ও তৃতীয় পাদের মধ্যে বাংলা দেশে একটা 'Upper Class Intellectual Aristocracy' ('উচ্চ শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজাততন্ত্র') গড়ে উঠেছিল।"[১৩] স্বাভাবিকভাবেই উপনিবেশিক শাসকদের প্রতি ছিল তাঁদের সহযোগিতা, আস্থা ও সহৃদয়তার মনোভাব।

ড. অশোক চট্টোপধ্যায়ের লেখায় আমরা পরিস্থিতির বর্ণনা পাইঃ

> "ব্রিটিশ শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবেই এ সময়ের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি ও বুদ্ধিজীবি-সাহিত্যিকরা এদেশে বিদেশী শাসনের অধীনেই নিজেদের চিন্তাগত বিন্যাস ও ভাবধারা বিকাশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ... এদেশে ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধতাকারী সমগ্র কৃষক বিদ্রোহকে তাঁরা কখনও সুনজরে দেখেননি । ... নির্মম দমনকার্যে সক্রিয় ও ভাবগত সহযোগিতা যুগিয়েছে এদেশীয় জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত প্রতিনিধিরা । ব্রিটিশশাসন-বিরোধী কৃষকবিদ্রোহীদের সুনজরে দেখেননি বঙ্কিমচন্দ্র। ... বিহারীলাল তাঁর তীতুমীরের জীবনীতে তিতুর মতো এহেন হীন কাজ আর কেউ যাতে না করে তার উপদেশ দেওয়ার জন্যই এই বই লিখেছিলেন। ... ১৮৩১ সালের জুলাই মাসে ... রামমোহন নির্দ্বিধায় বলেছিলেনঃ 'যদি আমাদের প্রশ্ন করা হয় কোন গভর্ণমেন্ট আমরা পছন্দ করবো? ইংরেজ না

অন্যকিছূ। আমরা সবাই একটিমাত্র উত্তর দেব, সর্বোতভাবে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ... প্রয়োজন পড়বে বহু বছরের ইংরেজ প্রভুত্ব ...' । রামমোহনের সহযোগী দ্বারকানাথও .. ইংরেজ শাসনকে এদেশীয়দের মঙ্গলের জন্যই বলে মনে করতেন।" বুদ্ধিজীবীরা সাঁওতাল বিদ্রোহ, মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭) , পাবনা-সিরাজগঞ্জের প্রজাবিদ্রোহকে .. বিরোধিতা করেছেন এবং প্রশ্নাতীত রাজানুগত্যের প্রমাণ রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বিদ্রোহীদের উপর ব্রিটিশ সরকার অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছিল। ...এহেন বিদ্রোহ-দমনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন .. বুদ্ধিজীবীরা।"[১৪]

১৮৫৭ সালের --

"মহাবিদ্রোহ আরম্ভ হলে পর 'কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য এক সভা করেন। ...বিদ্রোহ দমনে সরকারকে যাবতীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ... ঈশ্বরগুপ্ত লেখেন, 'সকল প্রকারে মহারাণীর জয় হউক... ব্রিটিশ অধীনে যেমন সুখে আছি, চিরকাল সেইরূপ সুখেই থাকিব'। ... অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহকে 'বিপদ' হিসেবে গণ্য ... করেছিলেন। সাধারনত বিদ্রোহ সম্পর্কে নিস্পৃহ মানসিকতা পোষণকারী বিদ্যাসাগরও এ সময় বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ-সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে দ্বিধান্বিত হননি। ...... রবীন্দ্রজনক দেবেন্দ্রনাথের সম্পাদকত্বে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ... ঘোষণা করেছিল ঃ বিদ্রোহীদের প্রতি কোনরকম সহানুভূতি নয়। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহে ভীত বিরক্ত দেবেন্দ্রনাথ যেমন 'সাঁওতালদের উপদ্রবে বঙ্গভূমি অস্থির' হওয়ার তথ্য আবিস্কার করেছিলেন তেমনি ১৮৫৭ এর মহাবিদ্রোহের

সময়ও 'ভয়ানক অত্যাচার' এর তথ্য খুঁজে পেয়েছিলেন ... প্রসন্নকুমার ঠাকুর সহ অন্যান্যদের সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহও 'নিজ ব্যয়ে' গোরা সৈন্য বাড়ীর সামনে মোতায়েন করেছিলেন। বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পর একটি পত্রিকা উল্লাসের সঙ্গে লিখেছিল, 'উর্দ্ধবাহু হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে নৃত্য কর। ... আমাদের প্রধান সেনাপতি সশস্ত্র হইয়া দিল্লী প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন শত্রুদিগের শিবিরাদি ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছেন।' এদেশের সমসময়ের বুদ্ধিজীবীরা ব্রিটিশ-রাজশক্তির স্বার্থকে যে নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে অভিন্নরূপে দেখেছিলেন তা এখানে স্পষ্ট।"[১৫]

রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৭৩ সালে এই শিক্ষিত মধ্যশ্রেনীর শ্রেণীগত ভিত্তি সম্পর্কে লিখেছিলেন,

"এদেশে সাধারণের মতামত বলতে বূঝায় অভিজাত সম্প্রদায়ের কিছু লোকের মতামত বা কিছু মধ্যবিত্তের মতামত। সোজা কথায় যাকে বলা হয় ভদ্রলোকের মতামত। তার সঙ্গে জমিতে লাঙল-ঠেলা লোকেদের বা খেটে-খাওয়া মানুষের মতামত কখনও এক হতে পারে না। এ তো বোঝাই যায় যে ওইসব ভদ্রলোকেরা স্বভাবতই জমিদারের পক্ষ নেবে। গ্রামের ভদ্ররলোকদের দশজনের মধ্যে নয়জনই .. ছোট বা বড় জমিদার বা জমিদারবাড়ীর লোক। শহরেও ক্ষমতাশালী ভদ্রলোকেরা প্রায় সবাই লক্ষপতি আর শিক্ষিত ... এরা সবাই প্রায় জমিদার।"[১৬]

উনিশ শতকের শেষ দিকে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা তুলনামুলকভাবে স্ফীত হয়ে ওঠে। উচ্চশ্রেণীভুক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় ছাড়াও মোটামুটি বড় আকারের এক সাধারন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর বিকাশ ঘটে। রাষ্ট্রের অপেক্ষাকৃত উচু ও লাভজনক পদগুলি ছিল ইংরেজদের একচেটিয়া দখলে। এদেশীয় শিক্ষিতরা ছিল মূলত 'বাবু' বা কেরাণী এবং

তাদের বেতনের হার ছিল সর্বদাই নিম্নমুখী। উপরন্তু এই সাধারণ শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী উনিশ শতকের শেষদিকে কঠিন কর্মসংকটের মুখোমুখী হয়। "উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বেকারত্ব ইতিমধ্যেই ভয়াবহ আকার নিয়েছিল। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে বেকারত্বের কারণে আর্থিক দুর্দশা থেকে রাজনৈতিক অসন্তোষ জন্ম নিয়েছিল।"[১৭]

বিদেশী লেখকদের উদ্ধৃত করে সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন,

> "ইংরেজ-রাজের সর্বব্যাপী শোষণ গভীরতর হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্প বেতনের কেরানীদের দুর্দশাও ক্রমশ বাড়িয়া যাইতে থাকে। ... বেকার উকিলে আদালত পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। ... কেরানীর চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ অনেক বেশী এবং বেতনের হার অবিশ্বাস্য নীচু।... প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সরবরাহ প্রায় দ্বিগুন। ... কৃষকের মতই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর এই চরম আর্থিক দুর্দশা তাহাদের মধ্যেও একটা ব্যপক বিক্ষোভ জাগাইয়া তোলে ... বিদেশী শাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণা তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ধুমায়িত করিয়া তোলে।"[১৮]

এভাবে সাধারণ শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সাথে ইংরেজ শাসকদের সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয় উনিশ শতকের শেষদিকে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁরা প্রভাব বিস্তার শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ এ পরিস্থিতিকেই বলছেন, "শিক্ষিত লোকদের মনে অল্পদিন হইল .... ঘোরতর সংশয় জন্মিয়াছে। সমস্ত ফাঁকি বলিয়া মনে হইতেছে।"

ক্রমাগত কৃষক-প্রজা বিদ্রোহ, গণবিক্ষোভ, সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্ষোভ-হতাশা-দাবীদাওয়া, সব মিলিয়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এক নিদারুণ সংকটে নিপতীত হয়। নবউদ্ভুত শ্রমিক শ্রেণীও আন্দোলন-সংগ্রামের মঞ্চে পদচারনা শুরু করে। ১৮৬২ সালে

হাওড়ায় ১২০০ রেলশ্রমিক দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করে; ঐ বছর কলকাতায় গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের এক ধর্মঘট হয়; ১৮৭৩ সালে ধর্মঘট করে আহমেদাবাদের ইটশ্রমিক ও দর্জিরা; ১৮৭৭ সালে নাগপুরে এমপ্রেস মিলে হয় শ্রমিকদের ধর্মঘট; ১৮৮১ সালে ঘুসুরী কটন মিলে ১০ দিনব্যপী এক ধর্মঘট হয়; ১৮৮২ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ২৫ টি গুরুত্বপুর্ণ ধর্মঘটের নজির পাওয়া যায়।[১৯] সুকোমল সেন তাঁর গ্রন্থে আরো অনেক ধর্মঘট ও শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

সামগ্রিক পরিস্থিতিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন এ আর দেশাই:

> "ভারতীয় জনসাধারনের যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ বিশেষ করে ১৮৭০ সালের পর দ্রুত বিস্তারলাভ করছিল, ১৮৮৩ সাল নাগাদ তা প্রায় বিস্ফোরক অবস্থায় উপনীত হয়। .... ভারতবর্ষ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। হিউম ও তার ভারতীয় উপদেষ্টাগণ ঠিক সময়মতোই হস্তক্ষেপ করবার উদ্যম করেছিলেন বলে অবস্থা সামলে যায়।"[২০]

সুপ্রকাশ রায় আরও বিস্তৃতভাবে পরিস্থিতির বিবরণ দিয়েছেন,

> 'ভারতের সর্বত্র কৃষক-জনগনের মধ্যে একটা ব্যপক সংগ্রামের মনোভাব স্পষ্ট হইয়া উঠে। .... এবার তাহারা সংঘবদ্ধভাবে হাতিয়ার লইয়া সংগ্রামের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার আয়োজন করে। ..... ভারতের নবজাত শিল্পের মধ্য হইতে শ্রমিকশ্রেণী এক নূতন সংগ্রামী শক্তিরূপে দেখা দেয়। ..... ভারতের নবজাত বস্ত্রশিল্পের বিকাশে বাধা দানের ফলে দেশীয় মালিকদের মধ্যে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব তীব্র হইয়া উঠে। .... শিক্ষিত সম্প্রদায়ের

আর্থিক দুর্দশা ও অপমানের গ্লানি তাহাদেরও সংগ্রামের পথে পা বাড়াইতে বাধ্য করে । ...... ভারতের এই জাতীয় জাগরণ হইতে একটা দুর্বার জাতীয় আন্দোলন যখন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে তখন এই আন্দোলন যাহাতে "সহিংস বিপ্লবের পথ গ্রহণ না করিয়া শাসকগোষ্ঠীর নিকট আবেদন-নিবেদনের অহিংস বা 'নির্দোষ' পন্থার গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহার ব্যবস্থা করাই ছিল হিউম সাহেব ও তাঁহার 'নরমপন্থী' নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য । তৎকালীন বড়লাটের পূর্ণ সম্মতি লইয়াই তাঁহারা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কার্যে অগ্রসর হন ।"[২১]

ঐতিহাসিক আর সি মজুমদারও হিউম সম্পর্কে লিখেছেন, "তিনি গভীরভাবেই এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে ভারতবর্ষে জনসাধারণের বিরাজমান অসন্তোষ সরকারের জন্য আসন্ন বিপদের লক্ষণ হয়ে দেখা দিয়েছে ।"[২২]

এই সময়ে মহারাষ্ট্রে বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের বিদ্রোহ এক নতুনতর তাৎপর্যপুর্ণ ঘটনা । তিনি ছিলেন নতুন ধরণের মধ্যবিত্ত বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী অংশের প্রতিনিধি । এক সময় তিনি পুনার ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসন বিভাগে অধস্থন কর্মচারী ছিলেন ।

"মারাঠা পেশোয়াদের প্রাক্তন কর্মচারী ও শেষে দরিদ্র হয়ে পড়া এক পরিবারে ফাড়কের জন্ম । তিনি শিক্ষিত ছিলেন এবং ভাল সংস্কৃত ও ইংরাজী জানতেন ।... তিনি তাঁর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার উৎখাতের জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি শুরু করেন । বিদ্রোহী কৃষকনেতা হরি নায়কের সঙ্গে যোগাযোগের পর ১৮৭৯ সালে তাঁর উদ্যোগে এক সৈন্যদল গঠিত হয় । শুরুতে স্থানীয় মহাজন ও সামন্তদের উপর তিনি

আক্রমন চালাতেন.. । ফাড়কে মহারাষ্ট্রের ব্যাপক কৃষক সাধারণের সাহায্যের উপর ভরসা করেছিলেন। তাদের সমর্থনেই তিনি ১৮৭৯ সালে দুঃসাহসী আক্রমণ চালান ও বড় বড় উৎখাত কার্যকর করা সম্ভবপর হয়। ... ফাড়কে ধরা পড়েন এবং ... যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হন। .... তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রজাতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক আদর্শের এক সরল সংশ্লেষন। ... সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা লাভের সংকল্পে তিনি অটল ছিলেন।”[২৩]

ভারতের প্রবীন বামপন্থী নেতা-সাংবাদিক অযোধ্যা সিংহ তাই তৎকালীন পরিস্থিতিকে বর্ননা করেছেন এভাবে, “নয়া বুদ্ধিজীবী, নতুন শিল্পপতি এবং শ্রমিক-কৃষক সকলেই একসঙ্গে জোট বাঁধতে শুরু করে। মনে হয় সারা দেশে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক ব্যপক ফ্রন্ট গঠিত হচ্ছে। .... ১৮৭৯ সালে মহারাষ্ট্রে বাসুদেব বলবন্ত ফারকের নেতৃত্বে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে, ... বলবন্ত ফারকে ছিলেন নতুন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিভু। ... তিনি কৃষক ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত করেন .....কৃষি বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। লর্ড লিটনের শাসনামলে (১৮৭৬-১৮৮০) ভারতবর্ষ এক বিপ্লবের যুগসন্ধিক্ষনে এসে দাঁড়ায়। ... এই আশঙ্কা নিয়ে যিনি সবচেয়ে বেশী চিন্তা করেন, তিনি হলেন, অ্যালেন অক্টাভিয়েন হিউম।”[২৪]

তৎকালীন এই বাস্তবতার প্রত্যক্ষদর্শী রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর সেই সময়কার লেখা ‘মন্ত্রি-অভিষেক’ও সমসাময়িক বাস্তবতাকে কিছুটা হলেও প্রতিফলিত করেছে:

"এমন সময় হিউম, ইউল, বেডারবর্ন কনগ্রেসকে অবলম্বন করিয়া আমাদের সেই নষ্ট বিশ্বাস উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাতে যে কেবল আমাদের রাজনৈতিক উন্নতি হইবে তাহা নহে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা যে নূতন শিক্ষা নূতন সভ্যতার আশ্রয়ে আনীত হইয়াছি তাহার প্রতি বিশ্বাস বলিষ্ঠ হইয়া তাহার সুফলসকল স্বেচ্ছাপূর্বক অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিব এবং এইরূপে আমাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'আমাদের' তথা সমসাময়িক শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও ইংরেজ শাসকদের প্রতি আস্থা-বিশ্বাস হয়ে পড়ছিল 'নষ্ট বিশ্বাস'; সেই 'নষ্ট বিশ্বাস' পুনরুদ্ধার করতে অগ্রসর হয়েছেন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী হিউম, ইউল প্রমুখ। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে হিউমের কংগ্রেস সৃষ্টির প্রয়াস ছিল ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ-সংগ্রাম-বিদ্রোহকে প্রশমিত করে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চিত্তকে বিক্ষিপ্ত' করে, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করারই অপপ্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, এর ফলে 'ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা যে নূতন শিক্ষা নূতন সভ্যতার আশ্রয়ে আনীত.....' হয়েছি। এই 'নূতন শিক্ষা' হচ্ছে ব্রিটিশ অধীনতায় গৌরবান্বিত হওয়ার শিক্ষা এবং 'নূতন সভ্যতার আশ্রয়' হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের পরাধীনতা। রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্রিটিশের উপনিবেশিক শাসন 'ঈশ্বরের ইচ্ছা', অর্থাৎ আশীর্বাদ ! অর্থাৎ ইংরেজ উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য! ঈশ্বরভক্ত রবীন্দ্রনাথের অবস্থান কি ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের পক্ষে যাচ্ছে না? তিনি কি ইংরেজ শাসন সম্পর্কে ইতিহাসের সত্যকে প্রতিনিধিত্ব করছেন?

(চার)

ইংরেজ-পুর্ব ভারতবিজেতাদের সাথে ইংরেজের মৌলিক পার্থক্য ছিল। পূর্ববর্তী বিজেতারা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে তথা উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থাকে স্পর্শ করেনি। করা তাদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না । তারা শুধু ক্ষমতার কাঠামোয় নিজেদের স্থাপন করেছিল। তারা কেউই বিদেশী থাকেনি। সবাই ভারতীয় বনে গিয়েছিল। ফলে ভারতীয় সম্পদ থেকে গিয়েছিল ভারতেই। কিন্তু ব্রিটিশ দখলকারীরা ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়, লুন্ঠনের স্বার্থে নতুন উৎপাদন, বিনিময় ও বন্টন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়, নিজেরা শেষপর্যন্ত বিদেশী দখলদারী শক্তি হিসেবেই টিকে থাকে, ভারতের বাইরে ভিন্ন দেশ থেকে তাদের শাসন-শোষণ-লুন্ঠণের কার্যকলাপ পরিচালনা করে এবং এদেশ থেকে বিপূল লুন্ঠিত সম্পদ তাদের নিজ দেশে পাচার করে। ইউরোপে দেশে দেশে যখন দেশীয় পূজিবাদ জয়লাভ করছিল তখন ভারতে জয়লাভ করেছিল বিদেশী ব্রিটিশ পুঁজিবাদ। ভারতীয় জনগণকেও শিল্পবিপ্লবের জন্য পুঁজি ও সম্পদের বিপুল জোগান দিতে হয়েছিল। তবে তা দেশীয় শিল্প বা পুঁজিবাদের জন্য নয়, ইংলন্ডের পুঁজিবাদের জন্য। তাদের এই জোগান পাচার হয়ে গিয়েছিল ছয় হাজার মাইল দূরে ভিন্ন দেশে অর্থাৎ ইংলন্ডে। এটাই ছিল ভারতবর্ষের সমস্ত অনুন্নতি ও দুর্দশার কারণ। ব্রিটিশের ভারত-দখলই ছিল তাই ভারতবর্ষের প্রথম পরাধীনতা।

কিন্তু ব্রিটিশের উপনিবেশিক শাসন-শোষণের ধরন সর্বদা একই রীতিতে থাকেনি। **১৭৫৭ - ১৮১৩** ছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নেতৃত্বে বৃটিশ 'বানিজ্যিক' পুঁজিবাদের একচেটিয়া লুটপাট। এর মধ্যে ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লব বানিজ্যের পুরো ধরণটাকে নাটকীয়ভাবে পাল্টে দেয়। **১৮১৩ - ১৮৫৭** সময়কালে প্রাধান্যে আসে শিল্পপুঁজিবাদের শোষণ। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী লগ্নীপুঁজি ভারতে তার থাবা বিস্তার শুরু

করে ।[২৫] এভাবে শোষণের তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শাসন, যদিও শোষণের পুর্ববর্তী ধরণগুলো কখনও অদৃশ্য হতো না, বরং সর্বদাই টিকে থাকত নতুনের পাশাপাশি ।

১৭৫৭-১৮১৩ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া লুটপাটের সময়কালে,

"কোম্পানীর প্রধান চেষ্টা ছিল ব্রিটেন ও ইউরোপের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানীকে সর্বোচ্চ পরিমানে উন্নীত করা । এর সাথে যোগ হয় ভূমি রাজস্ব, নানাবিধ কর ও প্রতারনার মাধ্যমে ভারতীয় গ্রামাঞ্চল থেকে সম্পদ সরাসরি নিংড়ে নেওয়া । দেশ দখল ও লুটপাট হাত মেলায় বাণিজ্যের সাথে । ... ভূমি খাজনা ও কর ছিল উদ্বৃত্ত মূল্য নিংড়ে নেওয়ার এক প্রধান উপায় । ইতিহাসের নজিরবিহীন হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতার সাথে ভূমি রাজস্ব আদায় করা হতো । .... কৃষকের সামর্থ্যকে কোনরূপ বিবেচনায় না এনে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ানো হত ভূমি রাজস্ব । ..... ফলে কৃষকরা সম্পুর্ণভাবে নিঃস্ব-কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ে । কৃষকদের সামান্য সঞ্চিত খাদ্যসহ শেষ পয়সাটুকু জোর করে কেড়ে নেওয়া হতো । দুর্ভিক্ষ হয়ে দাঁড়ায় নিত্যসংগী । সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল ১৭৬৯-৭০ সালের দুর্ভিক্ষ (ছিয়াত্তরে মন্বন্তর–লেখক) বাংলার মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশী মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।

ভূমি রাজস্ব থেকে বড় আকারের সম্পদ আহরণের ফলে ভারত থেকে বস্ত্র রপ্তানীর জন্য ব্রিটেনকে আর কিছু পরিশোধ করতে হতো না, পলাশীর যুদ্ধের আগে তাদের যা করতে হতো । ফলে তা হয়ে দাঁড়ায় ভারত থেকে ব্রিটেনে বিনা পয়সায় একতরফা পাচার ।"[২৬] "আমদানী ছাড়াই ভারত থেকে একটা রপ্তানী প্রবাহ উদ্ভূত হলো"[২৭]

ভূমি-রাজস্ব আদায় এতই পৈশাচিক ছিল যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বছরে কৃষকদের কাছ থেকে পূর্ববর্তী বছরের চেয়েও অনেক বেশী ভূমি রাজস্ব আদায় করে ইংরেজ শাসকরা। "খেয়াল- খুশী মতো যে মূল্য চাপিয়ে দেয়া হতো তাতেই তাঁতীরা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য থাকতো"।[২৮] "তারা (অর্থাৎ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী) এক চতুর্থাংশ দামে রায়ত (কৃষক) ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পণ্য কেড়ে নিত এবং এক টাকা দামের জিনিষ পাচ টাকায় কিনতে বাধ্য করত"।[২৯] শুধু কোম্পানী নয়, প্রতিটি ইংরেজ কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে নৃশংস অত্যাচার, দুর্নীতি ও লুটপাটের মাধ্যমে বিপুল সম্পদ এদেশ থেকে লুটে নিয়ে যেত। "বানিজ্য ছিল কোম্পানির উচ্চতন কর্মচারীদের একচেটিয়া। নুন, আফিম, পান ও অন্যান্য পণ্যের একচেটিয়া ছিল ধনের অফুরন্ত উৎস। কর্মচারীরা নিজেরাই দাম ঠিক করে দিত এবং অভাগা হিন্দুদের লুট করত। এই ব্যক্তিগত বাণিজ্যে অংশ নিতেন বড়লাট। ... সোনা বানাত শূণ্য থেকে। দিন যেতে না যেতেই ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠত মোটা মোটা সম্পদ; এক শিলিঙও অগ্রিম খরচ না করেই চলল আদি সঞ্চয়।"[৩০] "পৃথিবীর বুকে এমন কোন সভ্য সরকার কখনও ছিল না, যা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকারের মত এত দুর্নীতিবাজ, এত বেইমান এবং এত হিংস্র।"[৩১] "জমিতে আর চাষাবাদ হচ্ছে না; কৃষক লুণ্ঠিত; কারিগর নিপীড়নের শিকার; বারংবার দেখা দিচ্ছে দুর্ভিক্ষ; জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।"[৩২] "কোম্পানীর নিয়ন্ত্রনাধীন হিন্দুস্থানের এক তৃতীয়াংশ এলাকা বর্তমানে পশুদের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে"।[৩৩]

এভাবে পলাশীর যুদ্ধের পরে ভারত থেকে বিনামূল্যে ব্রিটেনে পাচার হয়ে যাওয়া বিপুল সম্পদই সেখানে শিল্পবিপ্লবকে সফল করে তোলে। ১৭৫৭ সালে "পলাশীর যুদ্ধের পরপরই, বাংলা থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ লন্ডনে পৌছানো শুরু করে। সাথে সাথেই শুরু হয় তার ফললাভ, কারণ সকলেই স্বীকার করবেন যে, 'শিল্পবিপ্লব' ... শুরু হয়েছিল ১৭৬০ সালে। ১৭৬০ সালের পূর্বে ল্যাঙ্কশায়ারের সুতা তৈরীর যন্ত্রপাতি ছিল প্রায় ভারতবর্ষের মতই

সাধারন।"[৩৪] "আঠারো শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষকে লুণ্ঠনের ভিত্তিতেই আধুনিক ইংলন্ড গড়ে উঠেছিল"।[৩৫]

শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংলন্ডে শিল্পপুঁজিবাদের সাথে কোম্পানীর বাণিজ্য পুঁজিবাদের সংঘাত তীব্র হয়ে ওঠে। ১৮১৩ সালে বিলুপ্ত হয় কোম্পানীর বানিজ্যিক একচেটিয়া এবং ১৮৩৩ সালে বন্ধ হয় কোম্পানীর সমস্ত বানিজ্যিক কার্যকলাপ ।

ব্রিটেনের "শিল্পপুঁজিবাদের অনুসৃত নীতি ছিল; ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের কৃষি উপনিবেশে রূপান্তরিত করা, যা তাকে সরবরাহ করবে কাঁচামাল এবং কিনবে শিল্পজাত দ্রব্য।"[৩৬] এজন্য তারা ভারতবর্ষে বিদ্যমান বস্ত্রসহ অন্যান্য হস্তশিল্পকে ধ্বংস করে দেয়। রমেশচন্দ্র দত্ত এ প্রসঙ্গে বলেন :

> "ইংলন্ডের সংকীর্ণ শাসননীতিই আমাদের এই শিল্পহানির কারণ। ... আমাদের শিল্প যতই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে,– ইংলন্ডের শিল্পের পক্ষে ততই সুবিধা –ততই অধিক কাটতি। ... ভারতের শাসনভার বৃটিশ হস্তে ন্যস্ত হইবামাত্র তাহারা ভারতীয় শিল্পের অবনতি সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। ... যে জাতি পূর্ব্বে অন্য জাতিকে বস্ত্র পরাইত, সে জাতিকে নিজের লজ্জা নিবারণের জন্য ইংলন্ডের শরণাপন্ন হইতে হইল। ... ইংলন্ড হইতে যে সকল দ্রব্যজাত ভারতে প্রেরিত হইবে, তাহাতে অতি যৎসামান্য শুল্ক বসান হইল। অপরপক্ষে ভারতের রপ্তানীর উপর বিলক্ষণ শুল্ক চাপান হইল। মারে রাজা রাখে কে – রাজা যখন এই রকম ভারতীয় শিল্পের গলা চিপিয়া ধরিলেন, তখন সে শিল্পকে কে রক্ষা করিবে?"[৩৭]

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর হেনরী জর্জকে উদ্ধৃত করে রমেশচন্দ্র দত্ত আরও লিখেছেন, ব্রিটিশ শাসকরা ভারতবর্ষের উৎপাদিত চিনির উপর শতকরা দুইশত ভাগ শুল্ক চাপিয়ে দেয়। বৃটিশ ঐতিহাসিক মিল ও স্টুয়ার্ট ১৮৫৮ সালে লিখেছিলেন, "ভারতীয় রেশম ও তুলার বস্ত্র নিজ মুনাফা রক্ষা করিয়া, তৎকালীন বিলাতী মাল অপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকা থেকে ৬০ টাকা কমমূল্যে বিক্রয় হইতে পারিত। সুতরাং বিলাতী মালকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতীয় মালের উপর শতকরা ৭০/৮০ টাকা শুল্ক বসান প্রয়োজন হইল। তাহা যদি না হইত, এই নিষেধসূচক শুল্ক যদি না বসিত, তাহলে পেমলি ও ম্যানচেষ্টারের কলগুলি আরম্ভেই বন্ধ হইয়া যাইত, এবং সেগুলিকে ষ্টীমের শক্তিতেও, পুনরায় চালান কঠিন হইত। ভারতীয় শিল্পের বলিদানে এই কলগুলির জন্ম। ভারত যদি স্বাধীন হইত, তাহা হইলে সে প্রতিশোধ লইত। সেও বিলাতী মালের উপর নিষেধসুচক শুল্ক চাপাইয়া দিত। ... ন্যায়যুদ্ধ হইলে বিলাতের জয়লাভ করার কোনই আশা ছিল না।"[৩৮]

সুতরাং বিলাতী বস্ত্রশিল্পের যান্ত্রিকীকরণ ও এর ফলে উৎপন্ন সস্তা মালের সাথে প্রতিযোগিতায় ভারতের হস্তশিল্প পরাস্ত হয়নি। একে বলপূর্বক টুঁটি চেপে হত্যা করেছিল ব্রিটিশ দখলকারীরা। "শুধু সুতীবস্ত্র বা রেশম শিল্প নয়, লোহা ইস্পাত জাহাজ নির্মান কাগজ ইত্যাদি শিল্প ও তাদের প্রযুক্তিবিদ্যা ইংরেজ শাসনের কল্যানে ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেল এবং বাংলা তথা ভারতবর্ষ ইংলন্ডের কৃষিখামারে পরিণত হল।"[৩৯]

বৃটিশ দখলের পুর্বে ভারতবর্ষ মোটেই নিছক কৃষিভিত্তিক দেশ ছিল না। এ প্রশ্নে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮৪০ সালে মন্টোগোমারি মার্টিনের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ন :

> "আমি এটা স্বীকার করি না যে ভারতবর্ষ একটি কৃষিভিত্তিক দেশ। ভারত সমানভাবেই শিল্প ও কৃষিভিত্তিক; যারা ভারতবর্ষকে কৃষিভিত্তিক দেশের স্তরে

নামিয়ে আনতে চায় তারা চায় সভ্যতার নিম্নতর ধাপে একে নামিয়ে আনতে। আমি এটা মনে করি না যে ভারতবর্ষকে ইংলন্ডের কৃষিখামারে পরিণত হতে হবে; এটি একটি শিল্পভিত্তিক দেশ, তার বিভিন্ন ধরণের শিল্প যুগ যুগ ধরে বিরাজ করেছে এবং কখনই কোন জাতি ন্যায্য উপায়ে তার সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারেনি । একটি কৃষিভিত্তিক দেশে পরিণত করা হবে ভারতবর্ষের প্রতি অন্যায়।"[৪০]

ইংলন্ডে বা ইউরোপে হস্তশিল্পকে প্রতিস্থাপন করেছিল যন্ত্রশিল্প। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী কোটি কোটি হস্তশিল্পী ও কারিগরদের তাদের পেশাসহ উচ্ছেদ করে, কিন্তু আধুনিক শিল্পবিকাশের পথকেও রুদ্ধ করে রাখে। এভাবে " শহর ও গ্রামের কোটি কোটি ধ্বংসপ্রাপ্ত কারিগর ও নিপুন শিল্পী, সুতাকাটুনি, তাঁতী, কামার, কুমার, ধাতুবিগলন কর্মী কোন পথ না পেয়ে কৃষিতে এসে ভীড় জমায়; ভারতবর্ষকে কৃষি ও শিল্পের সমন্বিত দেশ থেকে বলপূর্বক বৃটিশ শিল্প পুঁজিবাদের কৃষি উপনিবেশে পরিণত করা হয়।"[৪১]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী-পুঁজির বিনিয়োগ। রেলওয়ে, চা-কফি-রাবার বাগান, পাটকল, খনি, জাহাজ, বীমা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি ছিল বিনিয়োগের ক্ষেত্র। এই লগ্নী-পুঁজির উৎসও ছিল ভারতীয় জনগণ। "প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জনগণকে লুণ্ঠন করেই সৃষ্টি হতো এই ব্রিটিশ পুঁজি এবং তারপর তা ব্রিটেনের কাছে ভারতের ঋণ হিসেবে দেখানো হত, যার জন্য ভারতীয়দের পরিশোধ করতে হতো সুদ ও লভ্যাংশ।"[৪২]

ভারতে এই ধরনের ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের একক সর্ববৃহৎ ক্ষেত্র ছিল রেলওয়ে। "১৮৭১ সাল নাগাদ ভারতবর্ষের রেলপথের দৈর্ঘ্য ৫০০০ মাইল ছাড়িয়ে গেল ... ১৮৮১ নাগাদ এই দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ১০,০০০ মাইল, আরেক ধাক্কা ১৮৯৫ নাগাদ তাকে নিয়ে গেল ১৯,৫৫৫

মাইলে। সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র দেশ ভারতবর্ষ এখন রেলপথের দৈর্ঘ্যে সবচেয়ে ধনী দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী হলো। কিন্তু পশ্চিম ইয়োরোপ ও আমেরিকায়, যেখানে রেলপথ শিল্পবিপ্লবের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল, আর এখানে, ভারতবর্ষে, সে কাজ করলো পূর্ণ ঔপনিবেশীকরণের অনুঘটক হিসেবে।"[৪৩] রেলপথের প্রসার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলসহ গোটা ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের শিল্পপণ্যের বাজার ও কাচামালের যোগানদাতা হিসেবে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে। কৃষি উৎপাদকদের বাধ্য করা হয় বৃটেনের জন্য তুলা, পশম, পাট, নীল, আফিম, আখ ইত্যাদি বানিজ্যিক ফসল উৎপাদনে। ভারতীয় আফিম ছিল ব্রিটিশ আয়ের এক প্রধানতম উৎস। একটা নতুন আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ১৮৮৭ সাল নাগাদ ভারতবর্ষে ব্যবহৃত মোট কাপরের প্রায় ৭০ শতাংশ সরবরাহ করতো বৃটেন। ব্রিটিশ ধাতব শিল্প, যেমন লোহার জিনিষপত্র, ছুঁরি-কাচি, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের ব্যপক আমদানী শুরু হয়। "১৮৮০-র বছরগুলোতে ভারতবর্ষের বি-শিল্পায়নের প্রক্রিয়াটি কমবেশী সম্পূর্ন হয়ে গিয়েছিল"।[৪৪]

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছিলেন,

> "এই রেলওয়ে দ্বারা আমাদের অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে। ... রেলওয়ে রাজকোষে অর্থক্ষতি আনয়ন করিয়াছে। ... বার্ষিক লোকসান এখনও চলিতেছে। ... মালবহনের ব্যবসায়ে পূর্বে লক্ষ লক্ষ গরুর গাড়ীওয়ালা, মাঝি প্রভৃতি প্রতিপালিত হইত, – তাহাদের অন্ন গিয়াছে। লভ্যাংশ ইংলন্ডের অংশীদারদের আয় বৃদ্ধি করিতেছে। এই রেলওয়ের সাহায্যে ভারতের নগরে নগরে গ্রামে বিলাতী পণ্যজাত গিয়া পৌঁছিতেছে, – সুতরাং দেশীয় শিল্পাদির অবনতির পথ খুব প্রশস্থ হইয়াছে।... এই প্রকার প্রতিকুল অবস্থায় ভারতীয় শিল্প বিপন্ন। লোকে ক্রমশ অধিকতর পরিমানে কৃষির উপর নির্ভর করিতে

বাধ্য হইতেছে।... দেশের প্রজা নিরন্ন উপায়হীন;... দুর্ভিক্ষের প্রকোপে ছারখার হইতেছে। ভারতীয় সমগ্র রাজস্বের প্রায় একার্দ্ধ ভাগ পরিমাণ ধন, বৎসর বৎসর ভারত হইতে শোষিত হইতেছে – অথচ তাহার বিনিময়ে ভারত কিছুই পাইতেছে না। ঐ টাকায় ২৫ কোটি ভারতবাসীর সম্বৎসরের আহারের সংস্থান হইতে পারে।”[৪৫]

১৮৮১ সালে লিখিত এক পত্রে মার্কস চিহ্নিত করেছিলেন, রেলপথ ভারতীয়দের কোন কাজে আসেনি। ঐ একই পত্রে তিনি লিখেছিলেন,

“সাধারণ বিদ্রোহ যদি নাও হয়, গুরুতর জটিলতা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের জন্য ঘনিয়ে এসেছে। প্রতি বছর খাজনা আকারে, হিন্দুদের জন্য নিষ্ফল যে রেলওয়ে তার লভ্যাংশ হিসেবে, সামরিক ও সিভিল সার্ভিসে কর্মরতদের পেনসন, আফগানিস্থান ও অন্যান্য যুদ্ধ, ইত্যাদি ইত্যাদি বাবদ তারা যা বিনা খরচে নিয়ে যায় এবং ভারতের আভ্যন্তরে তারা নিজেরা বছরে বছরে যা আত্মসাত করে, এসবকিছু বাদ দিয়ে, ভারতীয়দের প্রত্যেক বছর যে পরিমান মূল্যের পণ্য বিনামূল্যে ইংলন্ডে পাঠাতে হয়, তা ভারতের ছয় কোটি কৃষি ও শিল্প শ্রমজীবিদের মোট আয়ের চেয়ে বেশী। এ হল প্রতিহিংসাপ্রসূত এক রক্ত ক্ষরনের প্রক্রিয়া। দুর্ভিক্ষের বছরগুলো গাদাগাদি করে রয়েছে এবং তার যা ব্যপ্তি তা ইউরোপে এখন পর্যন্ত অবিশ্বাস্য। একটা সত্যিকার ষড়যন্ত্র চলছে, যাতে হিন্দু ও মুসলমানরা পরস্পর সহযোগিতা করছে; বৃটিশ সরকার এটা অবহিত যে কিছূ ‘পাকিয়ে উঠছে’।”[৪৬]

'গুরুতর জটিলতা' এবং 'পাকিয়ে উঠছে' – এর মাধ্যমে মার্কস ভারতে বিদ্যমান বিস্ফোরনমুখ পরিস্থিতি সম্পর্কেই আলোকপাত করেছেন। বড় বড় অনেক লুণ্ঠন হিসেবে না এনে শুধু ইংলন্ডে বছরে বিনামূল্যে যে পণ্য পাচার হত তা প্রায় এক চতুর্থাংশ ভারতবাসীর বাৎসরিক আয়ের সমান। শোষণ-লুণ্ঠনের সমস্তটুকু হিসেবে ধরলে পরিমাণটা যে কি সীমাহীন ছিল তা অকল্পনীয়। সুপ্রকাশ রায় উপযুক্ত পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখিয়েছেন, "উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে রেলপথ স্থাপিত হইবার পর হইতে মহাদুর্ভিক্ষের আক্রমন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে"।[৪৭] ভারতবর্ষে স্থায়ী দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে তিনি যথার্থভাবেই দুটি কারণকে তুলে ধরেছেন: "(১) রেলপথ স্থাপন (৯) সেচ ব্যবস্থার ধ্বংস" সাধন।[৪৮] ভারতীয় কৃষককে যোগান দিতে হত বৃটেনের সাড়ে চার কোটি মানুষের খাদ্য, শিল্পের কাঁচামাল, বিশ্বজুড়ে উপনিবেশ বিস্তারের জন্য যুদ্ধের ব্যয়ভার। এজন্যই বিস্তীর্ন রেলপথ।

রবীন্দ্রনাথ এই সবকিছুরই প্রত্যক্ষদর্শী। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শোষণের ইতিহাসও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। এরপরও তিনি 'রাজভক্তি'র ভারে অবনত। তাঁর 'যথার্থ রাজভক্তি বৃদ্ধি' পাচ্ছেই। তিনি বলছেন, "হিউমকে নিকটে পাইয়া আমাদের ইংরাজী ইতিহাস শিক্ষার ফল সম্পুর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে – নতুবা আমরা যে সকল উদাহরণ দেখিয়াছি ও দেখিতেছি, তাহাতে সে শিক্ষা অনেক পরিমাণে নিস্ফল হইয়া যাইতেছিল। অতএব কনগ্রেসের দ্বারায় উত্তরোত্তর আমাদের যথার্থ রাজভক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং মহৎ মনুষত্বের নিকট সংস্পর্শ লাভ করিয়া আমাদের জীবনের মধ্যে অলক্ষিতভাবে মহত্ত্ব সঞ্চারিত হইতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ যখন এমনটি বলছেন সেই সময়কালে ভারতে বৃটিশ শোষণ, একের পর এক মহাদুর্ভিক্ষ ও বিরাজমান উত্তপ্ত পরিস্থিতি খোদ ইংল্যান্ডে ও ইউরোপেও ছিল বহুল আলোচিত বিষয়। এমনকি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকারী ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বা এর বাইরে অন্যান্য

বুদ্ধিজীবীরা এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ১৮৮৪ সালে 'সহচর' পত্রিকা লিখেছিল, ''লৌহপথের প্রসারের অর্থ আরো বেশী লৌহ শৃঙ্খল"।[৪৯] ১৮৮৪ সালে জি, ভি যোশী বলেছিলেন, রেলনীতি "বিস্ময়করভাবে কম সময়ের মধ্যে" দেশজ শিল্পকে "পিষে মেরে ফেলে" "দেশকে দেউলিয়া করে দিয়েছে"।[৫০] "১৮৭০ সালে অমৃতবাজার পত্রিকা ভারতবর্ষের দারিদ্রের জন্য অন্যতম কারণ হিসেবে ব্রিটিশ কতৃক সম্পদ নিষ্কাশনকে দায়ী করেছিল।"[৫১] ১৮৭২ সালে বিচারপতি রানাডে বলেছিলেন, "বাস্তবে ভারতবর্ষের জাতীয় আয়ের এক তৃতীয়াংশের বেশী ইংরেজরা কোন না কোনরূপে লুটে নিয়ে যাচ্ছে।"[৫২] জি ভি যোশীর হিসেবও ছিল এ থেকে অভিন্ন। ১৮৮০ সালে দাদাভাই নৌরজী জোর দিয়ে বলেছিলেন, "ভারত যে দুর্দশা কবলিত এবং ধ্বংসের সম্মূখীন তা নিদারুন অর্থনৈতিক নিয়মের অভিঘাতে নয় বরং নির্দয়, সমবেদনাহীন ব্রিটিশ নীতির ফলে নির্দয়ভাবে ভারতবর্ষের মজ্জা নিংড়ে নেওয়ার এবং ভারত থেকে সম্পদ নিষ্কাশনের জন্য অর্থনৈতিক নিয়মের বিকৃতি ঘটিয়ে ভারতকে রক্তক্ষরণে বাধ্য করার জন্য।"[৫৩] ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৭৩ সালের প্রেক্ষাপটে লিখেছিলেন, "সে সময়ে (ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সময়) ধনসম্পদ একটিমাত্র পথ দিয়েই নিষ্কাশিত হত। কিন্তু এখন এই নিষ্কাশনের পথের সংখ্যা অসংখ্য।"[৫৪]

নগ্ন বাস্তবতার এমন কিছূ স্বীকৃতির পরও রানাডে, যোশী এবং নৌরজীর মত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকারী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ শাসনাধীনে নিজেদের নিরাপদ মনে করতেন এবং ছিলেন হাড়ে-মজ্জায় বৃটিশ অনুগত-রাজভক্ত। তাঁরা ছিলেন ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদ টিকিয়ে রাখার পক্ষে। ব্রিটিশ কতৃক ভারতীয় জনগণের সম্পদ লুট করে নিয়ে যাওয়ার মূল সমস্যাটাকে "ভারতীয় নেতাদের মধ্যে রানাডে, যোশী, গোখলে এবং সম্ভবত আরো অনেকে ... প্রচার ও আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হিসেবে ... গ্রহণ করতে চাননি। ... সম্ভবত তাঁরা চেয়েছিলেন প্রশ্নটা আরও কিছু দিনের জন্য শিকেয় তোলা থাক।"[৫৫]

তখনকার বাংলার প্রধানতম তথা ভারতবর্ষের অন্যতম কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বলেছিলেন, "ইংল্যান্ড থেকে প্রাপ্ত বিধান বলেই আমাদের দেশের লোক ভোটাধিকার লাভ করবে। ... আমরা ব্রিটেনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ চাই না। যে মহান সাম্রাজ্য থেকে বিশ্বের অন্যান্য অংশ স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের আদর্শ লাভ করেছে, আমরা চিরদিনের জন্য সেই সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত থাকতে চাই।"[৫৬] একই সময়ে দাদাভাই নওরোজী বলেছেন, "আমরা প্রকৃতপক্ষে মানুষের মত বলব যে, আমাদের আনুগত্যে বিন্দুমাত্র খাদ নাই। ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের যে পরম লাভ হয়েছে সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি।"[৫৭] রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছিলেন, ''ভারতের জনসাধারণ আকস্মিক পরিবর্তন বা বিপ্লবের পক্ষপাতী নয়। ব্যবস্থাপক সভার বদৌলতে নতুন শাসনতন্ত্র পাওয়ার ব্যাপারেও তারা আগ্রহী নয়। বর্তমান সরকার আরও শক্তিশালী হোক এবং জনগনের সাথে তার যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হোক এইটাই তারা চায়"।[৫৮] প্রকৃতপক্ষে এই ছিল তখন কংগ্রেসের রাজনীতি, যা তরুণ রবীন্দ্রনাথেরও রাজনীতি। ১৮৮৫ সালে "মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জয়ধ্বনি দিয়ে অধিবেশন (কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন– লেখক) শুরু হয় আর সমাপ্তিও ঘোষিত হয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জয়ধ্বনি দিয়ে"[৫৯] রবীন্দ্রনাথ যখন অকুণ্ঠচিত্ত একাত্মতার সাথে ঘোষণা করছেন, "কনগ্রেসের দ্বারায় উত্তরোত্তর আমাদের যথার্থ রাজভক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে" তখন তিনি এই জয়ধ্বনিকেই প্রতিধ্বনিত করছেন।

এই রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবেই নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণীর স্বার্থ নগ্নভাবে জড়িত ছিল। বিপানচন্দ্র লিখেছেন, "তাঁরা (কংগ্রেস নেতারা) পুঁজিপতিদের সমর্থন করতেন এই কারণে যে তাঁরা বিশ্বাস করতেন ... দ্রুত শিল্পায়ন সেটা কার্যকরী করতে পারে একমাত্র এই শ্রেণী। তাঁরা শুধু এই অর্থে শিল্পপুঁজিপতিদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন...।"[৬০] এঁরা ভারতীয় শিল্পপুঁজিবাদের পক্ষে দাঁড়ালেও ছিলেন ব্রিটিশ শাসকদের মতই কৃষক স্বার্থের বিরোধী। এরা

ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাজারো বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাদের সহযোগিতার মাধ্যমেই চাইতেন শিল্পের বিকাশ । ভারতীয় পুঁজিবাদের স্বার্থে এরা অর্থনৈতিক প্রশ্নে বৃটিশ শোষনকে বেশ কিছু পরিমাণে উন্মোচিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন । কিন্তু সেই সমালোচনাকে রাজনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করে দেশীয় পুঁজিবাদের চুড়ান্ত ও প্রকৃত মুক্তি অর্জনের কর্মসূচী পর্যন্ত এগিয়ে নিতে অসমর্থ ছিলেন । এখানে এদের দ্বৈততা । তা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভরতা ছিল এদের মূল বৈশিষ্ট্য ।

চলবে

সৈয়দ আবুল কালাম: গবেষক, শিক্ষক ও নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক - *তিনটি পথনাটক*।

তথ্যসূত্র

১৩ । বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎ সমাজ, কলিকাতা, জানুয়ারী ২০০০, পৃঃ ১৪৯

১৪ । ডঃ অশোক চট্টোপধ্যায়, উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন্ ও কাঙাল হরিনাথ, কোলকাতা, ডিসেম্বর ২০০০, পৃঃ ১৪০-৪৪

১৫ । ঐ, পৃঃ ১৪৪-৪৬

১৬ । রমেশচন্দ্র দত্ত, বাংলার কৃষকসমাজ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪০৩, পৃঃ ৫৩

১৭ । এ আর দেশাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৮

১৮ । সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপবিক সংগ্রাম, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৭-৮

১৯ । সুকোমল সেন, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, কলকাতা, জানুয়ারী ২০০৩, পৃঃ ৭১-৭৪ থেকে গৃহীত তথ্যাদি

২০ । এ আর দেশাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৫

২১ । সুপ্রকাশ রায়ঃ ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপবিক সংগ্রাম, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ১৫-১৭

২২ । R.C. Majumder, History of the Freedom Movement In India, Calcutta, 1997, Vol – 1 Page 344.

২৩ । প্রগতি প্রকাশন, ভারতবর্ষের ইতিহাস, মস্কো, মস্কো, ১৯৮৬, পৃঃ ৪৭৪-৪৭৫ ।

২৪ । অযোধ্যা সিংহ, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৯৬, জানুয়ারী ১৯৯৬, পৃঃ ১০

২৫ । Sumit Sarker, প্রাগুক্ত, Page:24 এ প্রদত্ত তথ্য

২৬ । Hamza Alavi, Colonialism and Rise of Capitalism, Internet

২৭ । ইরফান হাবিব, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃঃ ২৯০ ।

২৮ । Hamza Alavi, প্রাগুক্ত

২৯। R. P. Dutt, India Today, Calcutta, June 1979, Page, 100, ইংরেজ গভর্নরের কাছে স্মারকলিপি, ১৭৬২ সন ।

৩০। কার্ল মার্কস, উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে, মস্কো, ১৯৭১, পৃঃ ৩১২

৩১। R. P. Dutt, প্রাগুক্ত, চধমব, ১০৩, স্যার জর্জ লুইস, ১৯৫৮ সালের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত

৩২। R. P. Dutt, প্রাগুক্ত, চধমব, ১০৮, উইলিয়াম ফুলারটন, পার্লামেন্ট সদস্য, ১৭৮৭ সালের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত

৩৩। R. P. Dutt, প্রাগুক্ত, চধমব, ১০৮, কর্ণওয়ালিশ এর ১৭৮৯ সালের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত

৩৪। R. P. Dutt, প্রাগুক্ত, চধমব, ১১১ ব্রুক এডামস এর বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত

৩৫। R. P. Dutt, প্রাগুক্ত, চধমব, ১০৮.

৩৬। R. P. Dutt, প্রাগুক্ত, চধমব,১২৩

৩৭। রমেশচন্দ্র দত্ত, বাংলার কৃষকসমাজ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪০৩, পৃঃ, ১৪৯-১৫২ বৃটিশ শাসনে ভারতের শিল্পের অবনতি, রচনা ১৯০১ সাল

৩৮। রমেশচন্দ্র দত্ত, ঐ, পৃঃ ১৫৩

৩৯। সুনীতি কুমার ঘোষ, বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি, কলকাতা, জানুয়ারী ২০০১, পৃঃ ৩৬

৪০। R. P. Dutt, প্রাগুক্ত, চধমব, ১২২

৪১। R. P. Dutt, প্রাগুক্ত, চধমব, ১২১

৪২। R. P. Dutt, প্রাগুক্ত, চধমব, ১৩৩

৪৩। ইরফান হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৪

৪৪। ইরফান হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৫

৪৫। রমেশচন্দ্র দত্ত, বাংলার কৃষকসমাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ, ১৫৩-১৫৬ বৃটিশ শাসনে ভারতের শিল্পের অবনতি, রচনা ১৯০১ সাল

৪৬। কার্ল মার্কস, দানিয়েলসন সমীপে পত্র, ১৮৮১

৪৭। সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ্ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৬

৪৮। ঐ, পৃঃ ১৭৯

৪৯। বিপানচন্দ্র, ভারতের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ১১৫

৫০। ঐ, পৃঃ ১১৬

৫১। ঐ, পৃঃ ৪৩৭

৫২। ঐ, পৃঃ ৪৩৫

৫৩। ঐ, পৃঃ ৪৪৪

৫৪। ঐ, পৃঃ ৪৩৬

৫৫। ঐ, পৃঃ ৪৬০

৫৬। এ আর দেশাই, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৮

৫৭। ঐ, পৃ: ২৫৮

৫৮। ঐ পৃ: ২৫৮

৫৯। অযোধ্যা সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২

৬০। বিপানচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১৩

আরো পড়ুন :
মুক্তমনায় সঙ্কলিত বিশেষ পাতা :

রবীন্দ্রনাথ : নির্মোহ বিশ্লেষণে মুক্তমনা লেখেকরা